অন্যকথা

ছোট পত্রিকা অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে একটি মেলার আয়োজন হয়েছিল গত বছর বাংলাদেশে। দুই বাংলার পাশাপাশি সে মেলায় অংশ নিয়েছিল বহির্বঙ্গ থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু বাংলা পত্রিকাও। মেলায় আয়োজন হয়েছিল বেশ কিছু আলোচনাসভার। এরকমই এক আলোচনাসভার বিষয় ছিল লিটল ম্যাগাজিনের সাম্প্রতিক অভিমুখ। কী হওয়া উচিত ছোট পত্রিকার পথ? সে কি পথভ্রষ্ট? আশা ছিল এমন বিষয় ঘনিয়ে তুলবে জোরালো এক বিতর্কের প্রতিবেশ। কিন্তু বেশির ভাগ বক্তার বক্তব্যে খুব বেশি তারতম্য পাওয়া গেল না। কোন পথে আবর্তিত হল সেদিনের আলোচনা? পড়ে ফেলা যাক সে আলোচনার নির্যাসটুকু।

নতুন প্রজন্মের লেখকরাই হবেন লিটল ম্যাগাজিনের মূল চালিকাশক্তি। হতে পারে তারা সদ্য লেখা শুরু করেছেন, সে লেখা হয়ত বা ততটা পরিণত নয়। কিন্তু বক্তব্যটি আকর্ষণীয় হলে লেখার মান সেখানে ততটা বিচার্য না হওয়াই উচিত বলে মত দিলেন কেউ কেউ। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই বাণিজ্যিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এমন লেখকের অন্তর্ভুক্তি হওয়া উচিত নয় ছোট পত্রিকায়। এমনকি তিনি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার অধিকার থেকেও হবেন বঞ্চিত! বইয়ের আয়তন কখনোই তিরিশ ফর্মার ঊর্ধ্বে যাবে না ইত্যাদি।

অর্থাৎ মতামত এল লেখক ও সম্পাদকের অবস্থান থেকে, পাঠক সেখানে একেবারে ব্রাত্য না হলেও গুরুত্বহীন। প্রশ্ন হল, এই ধরনের পত্রিকা নিশ্চয়ই নতুন প্রজন্মের লেখক, নতুন চিন্তায় জারিত রচনাকে গুরুত্ব দেবে, উৎসাহ দেবে পরীক্ষামূলক গদ্য বা কাব্যকে, আবিষ্কার করতে চাইবে সাহিত্যের নতুন ভাষ্য ও আঙ্গিককে, কিন্তু তা কি হবে অপরিণত রচনার সঙ্গে আপোশ করে? আবার কোনও প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকের উচ্চমানের রচনা কি প্রকাশিত হবে না তিনি বাণিজ্যিক কাগজে লিখেছেন বা যুক্ত আছেন এই অভিযোগের অজুহাতে? তাতে কি পাঠককেই বঞ্চিত করা হবে না? বাণিজ্যিক পত্রিকার সঙ্গে ছোট পত্রিকার এই চিরকালীন অসম লড়াইতে রুচির সঙ্গে আপস না করেও পাঠককে উৎকৃষ্ট ও

উন্নতমানের রচনা উপহার দেওয়ার কথা কি ভাববে না লিটল ম্যাগাজিন? সমস্তরকম ছুঁতমার্গ কি ঝেড়ে ফেলবে না অন্য ধারার পত্রিকা? একুশ শতকের দুটি দশক পার করে এসে আজ বাণিজ্যিক পত্রিকার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে গেলে বিষয়ভাবনায় অনন্য, লেখার উচ্চমুখী মান, লেখক তালিকায় নবীন প্রবীণের সম্মিলন — এরকমই কিছু পদক্ষেপ নিয়ে পত্রিকাকে গড়ে তুলতে হবে নয়া অভিমুখ। গত চার বছর ধরে ‘‘অন্যলেখ’’ সেই কাজটিই নিবিড়ভাবে করার চেষ্টা করে চলেছে।

২

প্রথম সংখ্যার পর আবারও এই সংখ্যায় ফিরে এল ক্রোড়পত্র। বছরের প্রথম দিকেই শতবর্ষ অতিক্রম করলেন চল্লিশের কবি হিসেবে পরিচিতি পাওয়া নরেশ গুহ। বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী চল্লিশের দশক। আবার জীবনানন্দ বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র পরবর্তী কবিতার কালটিকে এক অন্য অভিমুখে পরিচালিত করেছিলেন যে এক ঝাঁক কবি, চল্লিশের সেই কবিতার বৃত্তে এক অন্যস্বর বা রোমান্টিক মৃদুস্বরের ভাষ্যে ব্যতিক্রমী উপস্থিতি ছিল নরেশ গুহর। মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা এই কবি তো শুধুই কবিতার বৃত্তে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। গদ্য নির্মাণ, ‘টুকরো কথা’র সম্পাদনা, ইয়েট্‌স্ চর্চা এরকম বহুবিধ সৃজনে নিরন্তর মগ্ন থেকেছেন বুদ্ধদেব বসুর একদা ছায়াসঙ্গী এই কবি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলানো — এরকম বহুবিধ কাজেই তাঁর দক্ষতা আমাদের বিস্মিত করে। আবার গল্পকার নরেশ গুহ সম্পর্কেই বা কতটুকু আলোচনা হয় এখনকার সাহিত্যের আড্ডায় বা আসরে? প্রায় অনালোচিতই রয়ে গেছেন ‘‘দুরন্ত দুপুর’’-এর কবি। ব্যতিক্রম কি নেই? আছে, তবে তা খুবই সীমিত। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই কবিকে নিয়েই নির্মিত হয়েছে এই সংখ্যার প্রথম ক্রোড়পত্রটি।

৩

সারস্বত চর্চা যখন হয়ে ওঠে বহুমুখী এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেই মননশীল কর্মকুশলতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন সেই ব্যক্তিত্বের মেধাচিত্র বিশ্লেষণ স্বভাবতই কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। সমগ্রর দিকে নজর দিতে গিয়ে কি কোনও কোনও অংশ উপেক্ষিত থেকে যেতে পারে? অথবা অংশ থেকেই কি পৌঁছতে হবে সমগ্রতে? এই ধন্দ বা বিরোধটি আরও সংশয় তৈরি করে রণজিৎ গুহ নামক কিংবদন্তিসম ঐতিহাসিকের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর আলোচনায়। অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার, বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে নিম্নবর্গের ইতিহাসনির্মাণের পুরোধাপুরুষ হিসেবেই তো তাঁর পরিচিতি ও খ্যাতি। কিন্তু এই পরিচয়েই তো নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি রণজিৎ গুহ। তাঁর আরব্ধ কাজের ব্যাপ্তি তো নিম্নবর্গের ইতিহাস বা নিপীড়িত মানুষের ইতিহাসচর্চাকে ছাপিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল সাহিত্যের অন্দরে। যদিও সাহিত্যের উঠোনে তাঁর চলাচল জীবনের একেবারে শেষ লগ্নে যখন মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গ্রন্থ — ‘কবির নাম ও সর্বনাম’ এবং ‘ছয় ঋতুর গান’। তবে একথাও ঠিক ওই সাহিত্যচর্চা যে সর্বদাই অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রশংসা পেয়েছে, এমন নয়। আসলে রণজিৎ গুহর সাহিত্যচিন্তন ছিল দর্শন ও সমাজতত্ত্বের সংশ্লেষে জারিত। সাহিত্যের একমুখী বিশ্লেষণে এই ইতিহাসবিদের সাহিত্যচর্চার স্বরূপটি প্রকাশিত না হওয়াই স্বাভাবিক। আসলে রণজিৎ গুহর মতো বহুমুখী প্রতিভাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গেলে সমগ্র ও খণ্ডের চিরাচরিত ধন্দ বা সংশয়ের মুখোমুখি হতেই হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নরেশ গুহর মতো এই ঐতিহাসিকও এই বছর শতবর্ষ পূর্ণ করেছেন। তবে জীবদ্দশায় তাঁর আর দেখা হয়নি শতবর্ষপূর্তির দিনটি। সেই শুভমুহূর্তের মাত্র মাসখানেক আগেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। শতবর্ষ উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্রে তাঁর সামগ্রিক কীর্তি বা কৃতি, যেভাবেই ভাবা হোক, কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা তথা বিশ্লেষণ

করেছেন কতিপয় প্রাবন্ধিক। ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলো অবশ্য পূর্বোল্লিখিত সংশয়ের যাবতীয় সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব দূরে রাখারই চেষ্টা করেছে।

৪

শতবর্ষের প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়ল, তখন মনে পড়ে যাচ্ছে আর এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে, যিনি একশো পঁচিশ বছরের মাইলফলকটি পেরিয়ে গেলেন এই দু হাজার তেইশেই। রবীন্দ্র-উত্তর সময়ের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম, প্রান্তিক ও অন্ত্যজবর্গের জীবন ও জীবিকা যাঁর সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল, প্রায় ষাটটির মতো উপন্যাস ও দুশোটি ছোটগল্পের রচয়িতা — তিনি যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথার উল্লেখ অতিরেক মাত্র। প্রান্তিক মানুষেরা যে তাঁর সাহিত্যের অনেকাংশ জুড়ে — একথা বলতে গিয়ে এই কথাসাহিত্যিক স্বয়ং জানাচ্ছেন, ‘‘আমার সাহিত্যকর্মের মধ্যে কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বিশেষ ধারার ব্যক্তিত্ব, একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ সব আমার নিজের চোখে দেখা। ক্রমশ বিলীয়মান জমিদার-শ্রেণী আমার সাহিত্যে খুব বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। যখন ফ্যাসীবিরোধী দলের প্রতি প্রীতি ছিল, তখন তাঁরা পঞ্চমুখে এর প্রশংসা করেছেন। আবার মতবিরোধের ফলে সরে আসতে তাঁরা এই নিয়েই অর্থাৎ জমিদার-শ্রেণীর প্রতি মমতা পোষণের অপরাধে গালাগাল করেছেন এবং করেন। জমিদার-শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাক হরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধ করি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে কেউ লেখেন নি বা লেখেন না বলে। সামাজিক পেশার প্রভাবে এরা সচরাচর মানুষ থেকে স্বতন্ত্র এবং অভিনব হয়ে ওঠে’’। এ কারণেই কি তারাশঙ্কর ও তাঁর সাহিত্যকে আঞ্চলিকতার অভিঘাতে আক্রান্ত হতে হয়েছে বারবার? নাগরিক উন্নাসিকতায় ‘গেঁয়ো’, ‘রেঁঢ়ো’ ইত্যাদি বিশেষণে আক্রমণ করা হয়েছে তাঁকে? নিজেই সে কথা বলেছেন ‘আমার সাহিত্য জীবন’-এ। বলছেন, ‘‘সাহিত্য জীবনের প্রথম ভাগটা আমার ভাগ্যের অবহেলার কাল, অবজ্ঞার যুগ। অবহেলা অবজ্ঞার সে এক বোঝা ঘাড়ে নিয়ে পথ চলেছি’’। ‘অবহেলার কাল’কে অতিক্রম করে তিনিই হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ তিন কথাকারের একজন। তাঁর রচনায় প্রতিভাত হল শোষণ বঞ্চনাহীন আদর্শ সমাজব্যবস্থার ইতিকথা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম জ্ঞানপীঠ প্রাপক একশো পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত এই ঔপন্যাসিককে জানাই অন্তরের প্রণাম।

৫

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে সাহেবদের বিদেশি রঙ্গালয়ে থিয়েটারের যে অভিনয় নিয়মিত হয়েছে, সেখানে এদেশের নাগরিকদের ভূমিকা দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া মূলত দর্শকের। তিরিশের দশক থেকে বাংলার তথা কলকাতার অধিবাসীরা সরাসরি যুক্ত হতে শুরু করল থিয়েটারে। অভিনয় ও মঞ্চের সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ওই সময় থেকে শহরের বিত্তবানেরা আরম্ভ করলেন নাট্যানুষ্ঠান। সে আয়োজন হত কখনও বাগানবাড়িতে, কখনও বাড়ির দালানে। এই অভিনয়গুলোতে যাঁরা আসতেন তাঁরা ছিলেন আমন্ত্রিত দর্শক। অর্থাৎ সকলের সুযোগ ছিল না নাটক উপভোগের। কিন্তু ১৮৭২ সাল থেকে যে নাট্যপ্রদর্শন শুরু হল, তাতে কাঠামোটি একেবারে বদলে দেওয়া হল। জনসাধারণ সুযোগ পেল টিকিট কেটে নাটক দেখার, আর এভাবেই শুরু হয়ে গেল বাংলা রঙ্গমঞ্চের পেশাদারি যুগ। সেই পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রায় ষাট বছরের ইতিহাসটি বিবৃত হয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি উপন্যাসে। প্রথমটি ধারাবাহিকভাবে ও পরেরটি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত। লেখক ব্রাত্য বসু। নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবেই যাঁর পরিচিতি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের প্রধান দুই আইকন গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমার যে কাহিনি দুটির

কেন্দ্রে থাকবেন, এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে উপন্যাসটি প্রথমে রচিত (অদামৃতকথা) সেখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকলেও কেন্দ্রে কিন্তু আছেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও অমৃতলাল বসু। উপন্যাসের আলোচনা বা তার অন্দরে প্রবিষ্ট হয়ে মূল কাহিনির সুলুকসন্ধান সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে আলোচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন এক ঝাঁক প্রাবন্ধিক একটি ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে, যে ক্রোড়পত্রের বিষয় শুধুই এই দুটি উপন্যাস। উপন্যাস যখন হয়ে ওঠে ইতিহাসের আধার, তখন প্রশ্ন ওঠে, উপন্যাস তো কাহিনিনির্ভর। আবার ইতিহাস অতীতের সত্যকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। তবে কীভাবে এই আপাতবিরুদ্ধতাকে উপস্থাপন করেছেন উপন্যাস-লেখক? সে তত্ত্বতালাশের ভার রইল পাঠকের ওপর — উপন্যাসের অথবা প্রবন্ধের বা উভয় পাঠকের ওপরই।

৬

‘বাংলা কাব্য পরিচয়’-এর ভূমিকাংশে মধুসূদনের কাব্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “সকলের চেয়ে দুঃসাহসিকতা দেখালেন আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী মাইকেল মধুসূদন। তিনি যে মিলটনি বন্যায় দুরূহ শব্দতরঙ্গে বাংলা ভাষা তরঙ্গিত করে তুললেন তার মতো অপরিচিত অনভ্যস্ত আবির্ভাব বাঙালি পাঠকের কাছে আর কিছুই ছিল না। ... তখনকার ইংরেজি বিদ্যায় পরিপক্ক বাঙালির কাছে মিলটন শেক্সপিয়রের আদর আজকের দিনের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাই বাংলাভাষার যন্ত্রে মিলটনিয় মীড় মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে তারা বাহবা দিয়ে উঠল। মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভায় বাংলা ভাষার কাব্যরঙ্গভূমিতে প্রথম প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটা সম্ভব হোলো”। মাইকেলের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষেই যে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হল, তা’ বলাই বাহুল্য। তবে মধুসূদনের এই ব্যুৎপত্তি কি শুধুই ইংরেজি সাহিত্যে? একাধিক বিদেশি ভাষায় তিনি ছিলেন পারঙ্গম, যেমন ছিলেন সংস্কৃত, তেলেগু ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায়ও। তাঁর সাহিত্যের জীবন ছিল স্বল্প সময়ের। কিন্তু ওই স্বল্প সময়েই ঝড় তুলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত কাব্য ও নাট্য সাহিত্যের বিভাগে। কিন্তু ঝড় তুললে কি হবে, সমস্যা ছিল অন্যক্ষেত্রে। নিজের সৃজনক্ষমতার প্রতি চূড়ান্ত আস্থা থাকলেও ছিল না প্রতিভাকে সামলানোর জন্য গৃহিণীপনা। ফলে অচিরেই বন্ধ্যাত্ব গ্রাস করেছিল তাঁর সৃষ্টিকে। দ্বিশতবর্ষে এই অসামান্য প্রতিভাকে নিয়ে নিবেদিত হয়েছে দুটি প্রবন্ধ — যা কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। এই অবকাশে জানাই যে এই সংখ্যায় সাহিত্যে, সিনেমা, থিয়েটার ও আরও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবন্ধকারেরা।

৭

এ বছরের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তাঁকে ‘অন্যলেখ’ পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

এ বছর পত্রিকা প্রকাশে বেশ কিছুটা বিলম্ব হল। যাঁরা এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ী, তাঁরা নিশ্চিত এই দেরিটুকু উপেক্ষা না করে অপেক্ষা করেছেন এবং স্বভাবসৌজন্যে প্রশ্ন না তুলে নীরবতাই শ্রেয় মনে করেছেন। আসলে অপ্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কিছু অনিয়ন্ত্রিত সমস্যা। ছোট পত্রিকা বা অন্য ধারার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলেই কমবেশি এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। কিন্তু সমস্যা-কণ্টকাকীর্ণ পথেই নতুন ভাষ্যের আবিষ্কারে, পরীক্ষামূলক রচনায়, নিবিড় অভিনিবেশের মধ্যে দিয়ে ছোট পত্রিকাসমূহ অনির্বাণ দীপশিখাটি উঁচুতে তুলে রাখবে এই প্রত্যয়ে শেষ করছি সম্পাদকীয় নিবন্ধটি।

সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা।